‘ডিজিটাল, সোশ্যাল মিডিয়া এবং ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ২০২১’ বিষয়ক খসড়া প্রবিধানের ওপর হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি) এর মতামত

৫ মার্চ ২০২২

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ‘ডিজিটাল, সোশ্যাল মিডিয়া এবং ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ২০২১’ বিষয়ক খসড়া প্রবিধান তৈরি করে কমিশনের ওয়েবসাইটে ৫ মার্চ ২০২২ তারিখ পর্যন্ত সর্বসাধারণের পর্যবেক্ষণ, মতামত ও সুপারিশ প্রদানের জন্য আহ্বান জানিয়েছে। উক্ত আহ্বানের প্রেক্ষিতে হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি) এর পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করা হচ্ছে।

এইচআরএফবি মনে করে, এ ধরনের প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে তা জনগণের সাংবিধানিক অধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং এ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে কি না কিংবা এটি কোনোভাবে অপব্যবহার হওয়ার সুযোগ রয়েছে কিনা– সে বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করার অবকাশ রয়েছে। বিশেষত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০১৩ এবং পরবর্তী সময়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর নানাবিধ অপপ্রয়োগ যেভাবে গণমাধ্যম ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রকে সংকুচিত করেছে, সে অভিজ্ঞতার আলোকে ফোরাম মনে করে, এমন প্রবিধান প্রণয়নের পূর্বে সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের সাথে উন্মুক্ত আলোচনা ও সতর্ক পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। অন্যথা ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে প্রবিধান প্রণীত হলেও তার নানা ফাঁক ফুকুরের কারণে তা অপব্যবহৃত হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

- শুরুতেই ফোরাম উল্লেখ করতে চাচ্ছে যে, এ প্রবিধানের বেশ কয়েকটি দিক নিয়ে ফোরাম সদস্যদের উদ্বেগ রয়েছে যার মধ্যে অন্যতম পরিধি, প্রযোজ্যতা, পরিভাষাসংক্রান্ত স্পষ্টতার অভাব, নিবন্ধণ বিধান, প্রকাশিত বিষয়বস্তু অপসারণের ভিত্তি এবং বাক স্বাধীনতার উপর স্বেচ্ছাচারী বিধিনিষেধ আরোপকারী বিধান প্রভৃতি।
- ‘ডিজিটাল, সোশ্যাল মিডিয়া এবং ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ২০২১’ বিষয়ক খসড়া প্রবিধানটির পরিধি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত ‘ওভার দ্যা টপ (ওটিটি) কনটেন্টভিত্তিক পরিষেবা প্রদান এবং পরিচালনা এবং বিজ্ঞাপন প্রদর্শন নীতিমালা ২০২১ (খসড়া)’ এর পরিধির সাথে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে যা প্রায়োগিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করবে। কেন একই বিষয়ে দুটি পৃথক বিধান বা নীতিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে, তা স্পষ্ট নয়।
- আইন প্রণয়নের জন্য ইতিমধ্যেই আইন মন্ত্রণালয়ের সুনির্দিষ্ট শাখা ও আইন কমিশন রয়েছে। বিটিআরসি’র দায়িত্ব হল কমপ্লায়েন্স তদারকি করা, আইনের খসড়া না করে আইন বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না দেখা।
- এই নীতিমালায় ব্যবহৃত অনেক শব্দ ও বাক্যাংশকে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি বিধায় তা যেমন অপপ্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করবে পাশাপাশি অস্পষ্টতার সুযোগ রয়ে যাবে। যেমন: ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত সৃষ্টিকারী উপকরণ, সাম্প্রদায়িকতা, দেশীয় সংস্কৃতি, সামাজিক মূল্যবোধ– এগুলোসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল শব্দ ও বাক্যাংশের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা থাকা প্রয়োজন। একইসাথে ব্যতিক্রমসমূহ এবং যেসব ক্ষেত্রে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয় সেসবের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা দ্বারা বিধানটি সর্বসাধারণের জন্য সহজগম্য করা প্রয়োজন।
- খসড়ার ধারা ৬-এ কিছু বিষয়বস্তু তালিকাভুক্ত করা হয়েছে যার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে যেমন– মানহানির বিষয়বস্তু, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিঘ্নিত করা, সরকারি গোপনীয়তা ভঙ্গ করা, সার্বভৌমত্ব, জাতীয়

ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা, মুক্তিযুদ্ধ এবং জাতির পিতার চেতনায় আঘাত করা। উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এ এ ধরনের বিধানগুলোর কথা বলা হয়েছে। যেগুলোর ব্যাপক অপব্যবহার জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সমালোচিত হয়েছে।

- প্রবিধানগুলি ধর্মান্ধ, শিশু যৌন নিপীড়ক এবং জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বকে হুমকির মুখে ফেলে এমন যেকোনো ধরনের অনলাইন কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের নামে দেশে মুক্ত বুদ্ধি ও চিন্তার চর্চা, কল্যাণমূলক কাজ এবং গঠনমূলক বিতর্কের দ্বার সংকুচিত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।
- প্রবিধানের বিধানগুলিতে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর অনুরূপ বিধান রয়েছে যা বাংলাদেশ সংবিধানের মৌলিক অধিকার অংশে, অনুচ্ছেদ ৩৯ এ বর্ণিত চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতার অধিকার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এর মাধ্যমে জনগণের তথ্য অধিকারের সংকোচন ও গণমাধ্যমের ওপর বড় ধরনের চাপ তৈরির আশঙ্কা রয়েছে।
- ধারা ১(৩) তে বলা আছে কাদের উপর এই প্রবিধান প্রযোজ্য হবে। এটি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি, একজন ব্যাক্তির বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য হবে কেননা একজন ব্যক্তিও পারেন পরিষেবামূলক কাজ করতে, অথবা কন্টেন্ট বানাতে, বিভিন্নে ইস্যুতে তার মত প্রকাশ করতে। তখন তাকেও এই আইনের আওতায় আনা হবে।
- এই প্রবিধানের ধারা ৪ খুবই অস্পষ্ট এবং দুর্বোধ্য। এই ধারাটি কার জন্য প্রযোজ্য হবে সেটি সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। যদি এটি নতুন প্রকাশকদের জন্য হয়, তাহলে যারা ইতিমধ্যে অনলাইন মাধ্যমে রয়েছে বা কাজ করছে তাদের জন্য পদ্ধতি কি হবে সেটি বলা নেই।
- অনলাইনে বিষয়বস্তু ছড়িয়ে দেয়ার জন্য প্রবিধানের ধারা ৫ নিবন্ধনকে বাধ্যতামূলক করেছে। এই ধারাটি শুধুমাত্র লাইসেন্স পাওয়ার প্রক্রিয়াকে দীর্ঘায়িতই করে না, বরং লাইসেন্স প্রদানের বিষয়টি গোয়েন্দা সংস্থার বিবেচনার উপর ছেড়ে দেয়া হচ্ছে যে কাকে লাইসেন্স প্রদান করা হবে। এটি বৈষম্য সৃষ্টি ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহৃত হবার এবং মুক্ত চিন্তকদের জন্য অপ্রয়োজনীয় বাঁধা তৈরির সামিল।
- ধারা ৬-তে মধ্যস্থতাকারীদের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কে মধ্যস্থতাকারীদের জন্য যোগ্য হবে তা উল্লেখ করা হয়নি। ধারা ৬.০১ (খ) এ একটি দীর্ঘ তালিকা রয়েছে যাতে তথ্য হোস্ট, প্রদর্শন, আপলোড, পরিবর্তন, প্রকাশ, প্রেরণ এবং আপডেটের ব্যাপারে বিধিনিষেধ দেয়া হয়েছে, যা তথ্যের স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতার স্পষ্ট লঙ্ঘন এবং এটি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের বিতর্কিত ধারাগুলোর পুনরাবৃত্তি।
- আবার এই প্রবিধানের ধারা ৬ এবং ৭, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ধারা ৩৮ এর সাথে সাংঘর্ষিক। কেননা ধারা ৩৮ এ বলা হয়েছে, সেবা প্রদানকারীকে দায়ী করতে হবে না। অথচ, উল্লেখ্য ধারাতে ইন্টারনেটে বিষয়বস্তু পোস্ট করার জন্য মধ্যস্থতাকারীকে দায়ী করা হবে। অথচ এক্ষেত্রে তার কোনো ভূমিকা নেই।
- ধারা ৭ একজন নাগরিকের গোপনীয়তার অধিকার ক্ষুণ্ন করে। ধারা ৭.০৩ এ বলা হয়েছে যে, আদালত বা বিটিআরসি আদেশ দিলে, একটি বার্তার প্রথম প্রেরকের পরিচয় প্রকাশ করতে হবে। নতুন নিয়মের অধীনে, হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানো সমস্ত বার্তার এনক্রিপশন অবৈধ হয়ে যাবে যদি কোনো বার্তার উৎস সনাক্ত করতে হয়। ভাইরাল বার্তাটির প্রথম প্রেরককে সনাক্ত করার জন্য 'এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন' ভঙ্গ করতে হবে যা ব্যবহারকারীর তথ্যের নিরাপত্তা হুমকির মুখে ফেলবে এবং ব্যবহারকারীদের গোপনীয়তার লঙ্ঘন যা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৩ এর অধীনে সুরক্ষিত।
- এছাড়াও, খসড়া প্রবিধানটি অপব্যবহার প্রতিরোধ করার জন্য পর্যাপ্ত সুরক্ষা প্রদান করে না।

- এই বিধানে 'other less intrusive means' মানে কি বোঝায়, সেটি স্পষ্ট করে না।
- এই ধারাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে যোগ্য আবেদনকারীদের তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদিত একটি 'অনাপত্তি সার্টিফিকেট (এনওসি)' থাকতে হবে। এ প্রক্রিয়াটি জটিল হবে এবং এটি সঠিকভাবে পরিচালিত হবে কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়ে যায়।
- ধারা ৯ এ বলা আছে, তথ্য মন্ত্রণালয় সময়ে সময়ে নির্দেশ/অর্ডার/এথিক্স কোড প্রকাশ করবে। নিয়মনীতির ঘন ঘন পরিবর্তন, নতুন যারা নিবন্ধন করে ঢুকছে, তাদের জন্য বেশ বিভ্রান্তকর হবে।
- মত প্রকাশের স্বাধীনতার ন্যায় মৌলিক অধিকারকে এখানে একটি নির্বাহী কর্তৃপক্ষের আওতায় এনে লাইসেন্সিং এর অধীন করা হচ্ছে ।
- এটি নির্দোষ অনুমানের নীতিকেও (presumption of innocence) লঙ্ঘন করে কারণ এটি মত প্রকাশের স্বাধীনতা কার্যকর করার লাইসেন্স পাওয়ার অধিকারকে খর্ব করে যদি ব্যক্তি কোনো অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয় এবং ৫ বছর অতিবাহিত না হয়ে থাকে।
- ধারা ৬(১) এ বলা, একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস করতে মধ্যস্থতাকারীদের বাধ্য করে যেটা তাদের গোপনীয়তার অধিকার লঙ্ঘন করে আদালতের রায়ে (বাংলাদেশ বনাম অলি) ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস না করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করার পরেও এমন বিধান রাখা রায়ের লঙ্ঘন।
- ধারা ১১ বলে, 'জরুরি' ক্ষেত্রে তথ্য ব্লক করা হবে। সংবিধানে ইতিমধ্যেই এ সংক্রান্ত জরুরি বিধান রয়েছে। নতুন আইনে এটি পুনর্ব্যক্ত করার প্রয়োজন ছিল না।
- খসড়াটির ১১ ধারায় আরো বলা হয়েছে যে, ডিজিটাল সিকিউরিটি এজেন্সির মহাপরিচালককে 'জরুরী অবস্থার' ক্ষেত্রে শুনানি ছাড়াই যেকোনো বিষয়বস্তু সরানোর নির্দেশ দেওয়া উচিত। এই ধারাটি স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা অনুশীলনের সুযোগ দেয় এবং 'অডি অল্টারাম পার্টেম' নীতি লঙ্ঘন করে যার অর্থ 'অন্য পক্ষের কথা শুনতে হবে' এবং আইসিসিপিআর এর অনুচ্ছেদ ১৪ বর্ণিত অধিকার লঙ্ঘন করে।
- লাইসেন্স ফি ৫ লাখ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। নীতিটি ছোট কোম্পানি এবং পৃথক সামগ্রী নির্মাতাদেরকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে। লাইসেন্স পাওয়ার দীর্ঘ প্রক্রিয়া ব্যবসায় বাধা সৃষ্টি করবে।

সর্বোপরি হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি) মনে করে এ প্রবিধানের অধিকাংশ বিধান সংবিধান, মানবাধিকারের মূলনীতি এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদের সাথে সাংঘর্ষিক। একইসাথে টেকসই উন্নয়ন, যেখানে ইন্টারনেট ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, তার সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া এবং ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের প্রত্যয়ের ক্ষেত্রেও এমন প্রবিধান বাঁধার সৃষ্টি করতে পারে।